পঞ্চবিংশতি অধ্যায়

ভারতবর্ষের নির্বাচন কমিশন

— সুদেষ্ণা দাস

ভূমিকা :

গণতন্ত্র হল জনগণের শাসন। অন্য কথায় জনগণই হল গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু। গণতন্ত্রে ধরে নেওয়া হয় যে, জনগণ নিজেই নিজের প্রভু। নিজেদের শাসন করা কিংবা কীভাবে শাসিত হবে কিংবা কাদের দ্বারা শাসিত হবে তা ঠিক করার অবিচ্ছেদ্য অধিকার জনগণেরই। ক্ষমতা ও প্রাধান্যের জন্য মানুষ স্মরণাতীত কাল থেকে নিজেদের মধ্যে যে সংঘর্ষ করে চলেছে গণতন্ত্রে তা স্বীকৃতি পায়। তবে সেই সংঘর্ষের রূপ হবে মার্জিত। সশস্ত্র সংঘর্ষের পরিবর্তে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে হবে; বুলেটের পরিবর্তে ব্যালট ব্যবহৃত হবে। রাজনৈতিক গণতন্ত্র বলতে নির্বাচনে প্রত্যেক নাগরিকের স্বাধীন ভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করাকে বোঝায়। তাই গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য পইতটি প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের ভোটাধিকার থাকা একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করা হয়।

প্রাচীন ভারতে শাসন ব্যবস্থার রূপ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। বৈদিক যুগের প্রথম কিছু সময় বাদ দিলে সব ক্ষেত্রেই রাজার পদমর্যাদা ছিল বংশগত। আর অন্য দিকে সভা এবং সমিতিগুলি ছিল অভিজাত শ্রেণীর একচ্ছত্র এলাকা। গ্রাম সভা এবং পঞ্চায়েতগুলির কর্তৃত্বে থাকতেন গ্রামের বয়স্ক মানুষজন। তাঁরা কিন্তু সকলের দ্বারা নির্বাচিত হতেন না; গ্রামের কিছু সংখ্যক প্রভাবশালী মানুষজন তাঁদের ঐ পদে আসীন করতেন। এই ক্ষেত্রেও বংশ কৌলিন্য প্রাধান্য পেত। মোট কথা বলা যায় রাজতন্ত্রই প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারতের প্রধান অবলম্বন ছিল। ব্রিটিশরাই প্রথম এই ধরনের ব্যবস্থা বাতিল করে প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করার মধ্য দিয়ে প্রথম আধুনিক নির্বাচনের ধারণা এদেশে নিয়ে আসেন। কিন্তু ব্রিটিশ আমলেও নির্বাচন ব্যবস্থা সার্বজনীন ছিল না। তাদের নিজেদের আধিপত্য ক্ষুণ্ণ না করার তাগিদে প্রথম দিকে বিভিন্ন প্রশাসনিক পরিষদে ভারতীয়দের কোন স্থানই দেওয়া হত না। তবে পরবর্তীকালে আন্দোলনের চাপে পড়ে কিছু দেশীয় অভিজাত শ্রেণীর ব্যক্তিকে এই সমস্ত প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানে ঠাঁই দেওয়া হত।

ভারতবর্ষের উদারনৈতিক গণতন্ত্রের সমর্থকগণ অর্থনৈতিক অধিকার অপেক্ষা রাজনৈতিক অধিকারের উপর অধিক গুরুত্ব দিতেন। সেজন্য তাঁরা জনগণের রাজনৈতিক অধিকারকে সংবিধানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন।[১] আর তাই

Scanned with CamScanner

স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের মত একটি বৃহৎ দেশে নাগরিকরা যাতে স্বাধীনভাবে রাজনৈতিক অধিকার তথা পছন্দমত প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারা বা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে সংবিধান রচয়িতাগণ সংবিধানের পঞ্চদশ অংশে (৩২৪-৩২৯ নং অনুচ্ছেদ) তার ব্যবস্থা করেছেন। কারণ নির্বাচন যদি গণতান্ত্রিক না হয় তাহলে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা আর গণতান্ত্রিক থাকে না। কিন্তু তখনও ভারতবর্ষের অধিকাংশ জনগণই গণতান্ত্রিক সমাজের স্বাধীন নাগরিক হিসাবে দায়িত্ব পালনে ছিল অনভিজ্ঞ ও অপ্রস্তুত। এইরকম পরিস্থিতিতে সংবিধান রচয়িতাগণ মহিলা ও পুরুষ নির্বিশেষে সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ব্যবস্থা করার মত যে সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছিল তা সত্যই তাৎপর্যপূর্ণ। নির্বাচন কমিশন পরবর্তীকালে এ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলেন যে, "এটি একটি বিশ্বাসের সংবিধান (An Act of Faith)। ভারতের সাধারণ মানুষের উপর, তার বাস্তব সাধারণ জ্ঞানের উপর বিশ্বাস।"[২]

ভারতবর্ষের উদারনীতিবাদীর এ ব্যাপারে জন স্টুয়ার্ট মিল এর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। মিল মনে করতেন পুরুষ অথবা নারী যেই হোক তারা যাতে নিজেরা নিজেদের শাসন করতে পারে কেবলমাত্র তার জন্য তাদের রাজনৈতিক অধিকার প্রদানের দরকার নেই; বরং তারা যাতে অন্যের দ্বার কোনভাবে 'Missgovern' না হয় তার জন্য তাদের রাজনৈতিক অধিকার বেশী করে প্রয়োজন। অধিকাংশ পুরুষ জীবনধারণের জন্য মাঠে-ঘাটে কলকারখানায় কঠোর পরিশ্রম করে চলেছে; তাদের কাছে রাজনীতিক বিষয় অতটা গুরুত্ব পায় না বা অন্য কথায় তাদের রাজনীতি নিয়ে ভাববার অত সময় থাকে না। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তাদের ভোটাধিকারের প্রয়োজন নেই বা তারা যদি এটা দাবী করে তাহলে সেটা অন্যায্য একথা বলা যাবে না। কেউ এটা দাবী করতে পারে না যে, মহিলারা ভোটাধিকারের অপব্যবহার করবে। তাদের বিরুদ্ধে সব থেকে বাজে যে অভিযোগ করা যেতে পারে তাহল ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনেক সময়ই তারা তাদের পুরুষদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। মিল এর কথায়, যদি তাই হয় তাহলে তা হতে দাও। যদি তারা নিজেদের জন্য ভাবতে পারে সেটা খুবই ভালো হয়; আর যদি সেটা না হয় তাতে কিছু ক্ষতি নেই। মানব জাতি যদি হাঁটতে না চায়, হাঁটবে না, কিন্তু এই অজুহাতে তুমি তাদের পায়ে শৃঙ্খল পরিয়ে রাখতে পার না।[৩]

নির্বাচন কমিশনের গঠন :

ভারতের নির্বাচন কমিশন হল ভারতবর্ষের গণতন্ত্রের অন্যতম স্তম্ভ। স্বাধীন প্রশাসনিক সংস্থা হিসাবে নির্বাচন কমিশন গণতন্ত্রকে সুদৃঢ় করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুসানে হয়েবার রুডলফ এবং লয়েড আই রুডলফ এঁর মতে, "Election commission has a key position at the heart of the new regulatroy centrism of the

Indian state, as an institution (alongside the Presidency and the Suprem Court) with acts as an enforcer of rules that safegurd the democratic legitimacy of the political system."[৪] ভারতবর্ষের সংবিধান রচয়িতাগণ স্বাধীন নির্বাচন ব্যবস্থার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে নির্বাচন সংক্রান্ত গোটা পদ্ধতি ও গোটা নির্বাচন যন্ত্রের তদারকির জন্য এবং আনুষাঙ্গিক অন্যান্য কাজের জন্য সংবিধানে একটি স্বাধীন সংস্থা হিসাবে নির্বাচন কমিশন গঠনের ব্যবস্থা করা হয়েছে [৩২৪ নং ধারা]।[৫] সংসদের ও রাজ্য বিধান মন্ডলের সমস্ত নির্বাচন এবং রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচন তদারক করার, নির্দেশ দেবার ও পরিচালনা করার ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের [৩২৪(১) নং ধারা]। এই নির্বাচন কমিশন গঠিত হবে একজন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার দ্বারা; তবে রাষ্ট্রপতি অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করতে পারেন [৩২৪(২) নং ধারা]। তবে নির্বাচন কমিশনারের সংখ্যা একাধিক হলে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার কমিশনের সভাপতি হিসাবে কাজ করেন [৩২৪(৩) নং ধারা]। যদিও প্রথম থেকেই কেবল মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়েই নির্বাচন কমিশন গঠিত। কংগ্রেস(I) সরকার নবম সাধারণ নির্বাচন শুরু, হবার আগেই ১৯৮৯ সালের ১৬ই অক্টোবর মুখ্য নির্বাচন কমিশনার আর.ভি.এস.পেরি শাস্ত্রীর অধীনে আরো দুজন অতিরিক্ত কমিশনার নিয়োগ করেন। [এস.এস. ধানোয়া এবং ভি. এস. সায়গল], ফলে নির্বাচন কমিশন বহু সদস্য বিশিষ্ট হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু ১৯৯০ সালের ২ জানুয়ারী জাতীয় ফ্রন্ট সরকার কার্যভার গ্রহণ করার পর নির্বাচন কমিশনারকে পুনরায় এক সদস্য বিশিষ্ট করে। যদিও ১৯৯৩ সালে ১ অক্টোবর তৎকালীন কংগ্রেস সরকার [নরসিমা রাও সরকার] জরুরী ভিত্তিতে পুনরায় মুখ্য নির্বাচন কমিশনার টি. এন. সেশন এর অধীনে দুজন অতিরিক্ত কমিশনার [এম. এস. গিল এবং জি. ভি. কৃষ্ণমূর্তি] নিয়োগ করেন। তখন থেকে নির্বাচন কমিশন তিন সদস্য বিশিষ্ট হয়ে আসছে। তবে এই পদক্ষেপের পিছনে সুপ্রিম কোর্টের একটি রায়ের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ছিল বলে মনে করা হয়। ১৯৯১ সালে এস. এস. ধানোয়া বনাম ভারত সরকার মামলায় সুপ্রিম কোর্ট রায় দেন যে, "When an institution like the Election Commission is entrusted with vital functions and is armed to execute them, it is both necessary and desirable that the powers are not exercised by one individual, however wise he may be."[৬] নির্বাচন কমিশনের সাথে পরামর্শ করে রাষ্ট্রপতি লোকসভা বা রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের আগে নির্বাচন কমিশনকে সাহায্য করার জন্য আঞ্চলিক কমিশনারও নিয়োগ করতে পারেন [৩২৪(৪) নং ধারা]। বর্তমানে প্রতিটি রাজ্যে একজন করে মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক রয়েছেন এবং ১৯৬৬ সালে প্রণীত জনপ্রতিনিধিত্ব আইন অনুসারে প্রতিটি জেলায় একজন করে জেলা নির্বাচনী আধিকারিক নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়েছে।[৭]

Scanned with CamScanner

কার্যকালের মেয়াদ, অপসারণ পদ্ধতি ও বেতন :

সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনের মাধ্যমে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারদের চাকরির শর্তাবলী ও কার্যকালের মেয়াদ স্থিরকৃত হয়। প্রথম দুজন নির্বাচন কমিশনার সুকুমার সেন এবং কে. ভি. কে সুন্দরম কে ৫ বছরের জন্য নিয়োগ করা হলেও পরে তাঁদের কার্যকাল আরও ৩ বছর করে বাড়ানো হয়েছিল, অর্থাৎ তাঁদের প্রত্যেকের কার্যকাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল ৮ বছর। কিন্তু ১৯৭২ সালে এই নিয়ম বদল করে কার্যকালের মেয়াদ ৫ বছর করা হয় এবং বয়স অনধিক ৬৫ বছর করা হয়। পরবর্তীকালে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশন আইন ১৯৯১ অনুসারে এই কার্যকালের মেয়াদ ৬ বছর করা হয়।[৮] বর্তমানে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারের কার্যকালের মেয়াদ ৬ বছর। তবে ঐ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে যদি তাঁদের বয়স ৬৫ বছর পূর্ণ হয় তাহলে তাঁদের কার্যকালের মেয়াদের পরিসমাপ্তি ঘটে।

প্রমাণিত অসমার্থ কিংবা অসদাচরণের জন্য রাষ্ট্রপতি মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে পদচ্যুতও করতে পারেন [৩২৪(৫) নং ধারা]। তবে সেক্ষেত্রে বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। যে পদ্ধতিতে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের অপসারণ করা যায় সেই পদ্ধতিতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারদেরকেও অপসারণ করা যায়। অর্থাৎ সংসদের প্রতিটি কক্ষের মোট সদস্যের অধিকাংশ এবং উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থনে যদি মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের অপসারণ প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহলেই কেবলমাত্র রাষ্ট্রপতি তাঁকে অপসারিত করতে পারেন। নির্বাচন কমিশনের অন্যান্য কমিশনার এবং আঞ্চলিক কমিশনারদের রাষ্ট্রপতি মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সুপারিশক্রমে অপসারিত করতে পারেন। মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের এই সুপারিশ ছাড়া রাষ্ট্রপতি অন্যান্য কমিশনার এবং আঞ্চলিক কমিশনারদের অপসারিত করতে পারেন না [৩২৪(৫) নং ধারা]। নির্বাচন কমিশনের সদস্যদের বেতন ভাতা ইত্যাদি সংসদের অনুমোদন সাপেক্ষ নয়। এগুলি ভারতের সঞ্চিত তহবিল থেকে প্রদান করা হয়। বর্তমানে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনারদের বেতন ৯০,০০০ টাকা।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের পদমর্যাদা :

১৯৯৩ সালে নির্বাচন কমিশনে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের অধীনে আরও দুজন নির্বাচন কমিশনারকে নিয়োগ করা হলে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের পদমর্যাদা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়ে যায়। সংবিধান অনুসারে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার অন্যান্য কমিশনারের থেকে উচ্চ পদমর্যাদার অধিকারী। এর স্বপক্ষে যে যে যুক্তি উত্থাপন করা যেতে পারে সেগুলি হল-

প্রথমতঃ 'মুখ্য' (Chief) শব্দটির মধ্য দিয়ে তাঁর অবস্থান সম্পর্কে আমরা প্রাথমিক ভাবে অনুমান করতে পারি যে, তিনিই প্রধান।

দ্বিতীয়তঃ নির্বাচন কমিশনারের সংখ্যা একাধিক হলে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার কমিশনের সভাপতি হিসাবে কাজ করেন। এটাও তাঁর উচ্চ পদমর্যাদার একটা দিক হিসাবে ধরা যেতে পারে।

তৃতীয়তঃ মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের পৃথক অপসারণ পদ্ধতি তাঁর উচ্চ পদমর্যাদাকে ইঙ্গিত করে। সংসদের প্রতিটি কক্ষের মোট সদস্যের অধিকাংশ এবং উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থনে যদি মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের অপসারণ প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহলেই কেবলমাত্র রাষ্ট্রপতি তাঁকে অপসারিত করতে পারেন। অন্যদিকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সুপারিশ ছাড়া রাষ্ট্রপতি অন্যান্য কমিশনার এবং আঞ্চলিক কমিশনারদের অপসারিত করতে পারেন না। অর্থাৎ এর মধ্য দিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার অন্যান্য কমিশনারদের অপসারণ করার ক্ষমতা রাখেন।

চতুর্থত ঃ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সংবাদ মাধ্যমের কাছে কমিশনের মুখপাত্র হিসাবে ভূমিকা পালন করেন।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের পদমর্যাদা সংক্রান্ত বিতর্ক সুপ্রিম কোর্টের একটি রায়ের মধ্য দিয়ে প্রকাশ্যে চলে আসে; যখন তৎকালীন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার টি. এন. সেশন নরসিমা রাও সরকারের জরুরী ভিত্তিতে আরও দুজন নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ এবং উক্ত তিনজন কমিশনারের মধ্যে ক্ষমতা বন্টন সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের মামলা করেন। সুপ্রিম কোর্ট তার চূড়ান্ত রায়ে ঘোষণা করে যে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটেই কমিশন যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। এই রায়ের মধ্য দিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্যান্য কমিশনার মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের মতই ক্ষমতার অধিকারী হলেন। যদিও এর কিছুকাল পূর্বে 'এস. এস. ধাওয়ান বনাম ভারত সরকার' (১৯৯১) মামলায় সুপ্রিম কোর্ট মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের উচ্চ পদমর্যাদাকেই স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।[৯]

মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের তালিকা :

নং	নাম	কার্যকাল	
১	সুকুমার সেন	২১ মার্চ ১৯৫০	১৯ ডিসেম্বর ১৯৫৮
২	কল্যাণ সুন্দরম	২০ ডিসেম্বর ১৯৫৮	৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৬৭
৩	এস.পি. সেন ভার্মা	১ অক্টোবর ১৯৬৭	৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৭২
৪	নগেন্দ্র সিং	১ অক্টোবর ১৯৭২	৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩
৫	টি. স্বামীনাথন	৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩	১৭ জুন ১৯৭৭
৬	এস.এল. শাকধার	১৮ জুন ১৯৭৭	১৭জুন ১৯৮২
৭	আর. কে. ত্রিবেদী	১৮ জুন ১৯৮২	৩১ ডিসেম্বর ১৯৮৫

Scanned with CamScanner

নং	নাম	কার্যকাল	
৮	আর.ভি.এস. পেরি শাস্ত্রী	১ জানুয়ারী ১৯৮৬	২৫ নভেম্বর ১৯৯০
৯	ভি. এস. রমাদেবী	২৬ নভেম্বর ১৯৯০	১১ ডিসেম্বর ১৯৯০
১০	টি. এন. সেশন	১২ ডিসেম্বর ১৯৯০	১১ ডিসেম্বর ১৯৯৬
১১	এম.এস গিল	১২ ডিসেম্বর ১৯৯০	১৩ জুন ২০০১
১২	জে এম লিঙ্গদোহ	১৪ জুন ২০০১	৭ ফেব্রুয়ারী ২০০৪
১৩	টি. এস. কৃষ্ণমূর্তি	৮ ফেব্রুয়ারী ২০০৪	১৫ মে ২০০৫
১৪	বি. বি. টনডন এন.	১৬ মে ২০০৫	২৯ জুন ২০০৬
১৫	এন. গোপালস্বামী	৩০ জুন ২০০৬	২০ এপ্রিল ২০০৯
১৬	নবীন চাওলা	২১ এপ্রিল ২০০৯	২৯ জুলাই ২০১০
১৭	এস.ওয়াই কুরেশি	৩০ জুলাই ২০১০	১০ জুন ২০১২
১৮	ভি. এস. সম্পথ	১০ জুন ২০১২	১৫ জানুয়ারী ২০১৫
১৯	হরিশঙ্কর ব্রহ্ম	১৫ জানুয়ারী ২০১৫	১৮ এপ্রিল ২০১৫
২০	নাসিম জাইদি	১৯ এপ্রিল ২০১৫	১২ জুলাই ২০১৭
২১	অচল কুমার জ্যোতি	৬ই জুলাই ২০১৭	২২ জানুয়ারী ২০১৮
২২	ওমপ্রকাশ রাওয়াত	২৩ জানুয়ারী ২০১৮	১ ডিসেম্বর ২০১৮
২৩	সুনিল আরোরা	২ ডিসেম্বর ২০১৮	এখন পর্যন্ত

উৎস: https://en.wikipedia.org/wiki/chief Election Commissioner of India.

নির্বাচন কমিশনের কাঠামো :

নির্বাচন কমিশন একটি স্বাধীন সংস্থা হলেও কমিশন তার নিজের কর্মচারীদের নিয়োগ বা চাকরীর শর্তাবলী নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। সরকারের অন্যান্য কর্মচারীদের ক্ষেত্রে যে ধরনের নিয়মকানুন প্রযোজ্য এদের ক্ষেত্রেও তাই বর্তমানে নির্বাচন কমিশনের কর্মচারীবৃন্দ হলেন-

১) মুখ্য নির্বাচন কমিশনার
২) দুইজন নির্বাচন কমিশনার
৩) তিনজন ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার
৪) আঞ্চলিক নির্বাচন কমিশনার
৫) সভাপতি

৬) সহ-সভাপতি
৭) গবেষণা আধিকারিক
৮) তত্ত্বাবধায়ক/সহতত্ত্বধায়ক/বয়ঃজ্যেষ্ঠ আধিকারিক
৯) মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের ব্যক্তিগত সচিব
১০) নির্বাচন কমিশনারদের ব্যক্তিগত সচিব
১১) ডেপুটি নির্বাচন কমিশনারের ব্যক্তিগত সচিব
১২) হিন্দি আধিকারিক
১৩) গ্রন্থাগারিক
১৪) বয়ঃজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগত সহায়ক
১৫) সহায়ক
১৬) সাংকেতিক লিপিকার
১৭) চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী

নির্বাচন কমিশনের সচিবালয় ছয়টি ভাগে বিভক্ত, যাদের মূল কাজ হল সংসদ ও এবং রাজ্য আইনসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে নির্বাচনী আচরণবিধি তৈরী করা সংক্রান্ত সমস্ত রকমের প্রশ্ন ও বিষয় সামাল দেওয়া। কোন একটি নির্বাচনী ক্ষেত্রে (Constituency) নির্বাচনী আচরণবিধি তৈরী ও রক্ষণাবেক্ষণ করার ক্ষেত্রে যাঁরা প্রধান ভূমিকা নেন তাঁরা হলেন নির্বাচন কমিশন, সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক এবং নির্বাচনী নথিভুক্তকারী আধিকারিক (Electoral Registration Officer)। প্রত্যেক সংসদীয় অথবা বিধানসভার নির্বাচনী ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন একজন করে Returning Officer নিয়োগ করেন, যিনি একজন সহকারী আধিকারিক। এর পাশাপাশি সরকারী আধিকারিকদের মধ্যে থেকে একজন Assistant Returning Officer-কেও নিয়োগ করা হয় যাঁর অবস্থান Returning Officer এর ঠিক নিচে। Assistant Returning Officer এর অধীনে একজন করে Sector Officer নিয়োগ করা হয়; এনারাও সরকারী কর্মচারী। Sector Officer এর অধীনে একাধিক ভোট গ্রহণ কেন্দ্র বা বুথ থাকে। প্রত্যেকটি বুথের দায়িত্বে থাকেন একজন করে Presiding Officer এবং তাঁর অধীনে থাকেন তিনজন Polling Officer। এই সমস্ত আধিকারিকগণ কেন্দ্র অথবা রাজ্য সরকারের কর্মচারী, রাজ্য সরকারের সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল কলেজের শিক্ষক, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েতে ইত্যাদির কর্মচারী। Presiding Officer নির্বাচনের দিন সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সংশ্লিষ্ট বুথের আইন শৃঙ্খলা রক্ষা এবং শান্তিপূর্ণ ভাবে ভোট গ্রহণ পর্ব সম্পন্নকরার ভার তাঁরই হাতে থাকে। নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের সময় নির্বাচন পরিদর্শক নিয়োগ করেন। তাঁরা এটা পরীক্ষা করে দেখেন যে রাজনৈতিক

Scanned with CamScanner

দল এবং জনগণ নির্বাচনী আচরণবিধি ঠিকঠাক মান্য করছে কিনা বা সব জায়গায় শান্তিপূর্ণ ভাবে নির্বাচন সম্পন্ন হচ্ছে কিনা। নির্বাচন চলাকালীন নির্বাচন কার্যে যুক্ত সকল কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের আধিকারিকগণ নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বধানে পরিচালিত হবেন। এই সময় যদি কোন আধিকারিক নির্বাচনের নিয়ম-কানুন ভঙ্গ করেন কিংবা কোন দুর্নীতিমূলক কার্যে লিপ্ত হন তাহলে কমিশন তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারবেন। এইভাবে নির্বাচনের সময় নির্বাচন কমিশন দেশের প্রকৃত সরকার হিসাবে দায়িত্ব পালন করে থাকে।[১০]

নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যাবলী :

সংসদ, বিধানসভা, রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় নির্বাচন সংক্রান্ত কার্যাবলীর তত্ত্বধান, নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণ এর সমস্ত রকমের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশন পালন করে থাকেন [৩২৪(১) নং ধারা]। নির্বাচন কমিশনের কার্যাবলী নিম্নে আলোচনা করা হল।

প্রথমত: নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার পূর্বে প্রত্যেক নির্বাচন ক্ষেত্রের জন্য কমিশন ভোটার তালিকা প্রস্তুত করেন, যে তালিকায় সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী ক্ষেত্রের সকল যোগ্য ভোটারের নাম থাকে। যোগ্য ভোটার বলতে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী ক্ষেত্রে অস্থায়ী বাসিন্দা, বিকৃতমস্তিষ্ক, দেউলিয়া অথবা দুর্বৃত্ত ছাড়া ১৮ বছর বয়স্ক [১৯৮৮ সালে ৬১তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে ভোট দানের ন্যূনতম বয়স ২১ থেকে কমিয়ে ১৮ করা হয়] প্রতিটি ভারতীয় নাগরিক ভোটদানের অধিকারী। কমিশনের নির্বাচনী আচরণবিধি প্রকাশ করা হয় জনগণের মতামত নেওয়ার জন্য। যদি কোথাও কোন ভুল থাকে তাহলে তা সংশোধন করে নেওয়াই এর উদ্দেশ্য। এগুলিই হল কমিশনের প্রাথমিক কাজ।

দ্বিতীয়ত: কোন রাজনৈতিক দলকে স্বীকৃতি দান কিংবা নির্বাচনী প্রতীক নিয়ে বিরোধ দেখা দিলে তার নিষ্পত্তি করা কমিশনের কাজ।

তৃতীয়ত: কমিশন নির্বাচনের তারিখ ঠিক করেন এবং তার একটা তালিকা জনগণের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করে। এটি মনোনয়ন পত্র পেশ ও প্রত্যাহার করার শেষ দিনটা নির্দিষ্ট করে দেয় এবং পেশ করা মনোনয়ন পত্রের বৈধতা বিচার করে। সবশেষে নির্বাচন সুষ্ঠ ভাবে সম্পন্ন করা ও তার ফল প্রকাশ করা।

চতুর্থত: নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক দল এবং জনগণকে কী কী আচরণবিধি মেনে চলতে হবে তা নির্ধারণ করা কমিশনের কাজ।

পঞ্চমত: সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন পরিচালনার জন্য কমিশন রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালের কাছে প্রয়োজনীয় সংখ্যাক কর্মচারী নিয়োগের জন্য অনুরোধ করতে পারে [৩২৪ (৬) নং ধারা]।

ষষ্ঠত: কোন ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে যদি নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘিত হয়েছে অর্থাৎ গায়ের জোরে ভোট কেন্দ্র দখল, জাল ভোট প্রদান, ভয় দেখিয়ে ভোটারদেরকে ভোট প্রদানে বাধা দান প্রভৃতির মত ঘটনা ঘটেছে বলে কমিশন মনে করলে সংশ্লিষ্ট ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের নির্বাচন স্থগিত রাখা অথবা পুনরায় নির্বাচনের জন্য কমিশন নির্দেশ দিতে পারে।

সপ্তমত: আইনসভার কোনও সদস্যের অযোগ্যতার ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি কিংবা ক্ষেত্রবিশেষে রাজ্যপালকে কমিশন অবগত করতে পারেন।[১১]

নির্বাচনী আচরণবিধি :

নির্বাচনী আচরণবিধি হল কিছু বিধি-নিষেধের একটি তালিকা যার মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের সময় অবাধ ও স্বাধীন নির্বাচনের স্বার্থে রাজনৈতিক দল ও জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। প্রত্যেক নির্বাচনের আগে কমিশন একটি নির্বাচনী আচরণবিধি তৈরী করে। নির্বাচনের দিন ঘোষণার পর থেকে ফল প্রকাশিত হবার আগে পর্যন্ত এই বিধি কার্যকর থাকে। এই ভাবে ২০১৪ সালের ৫ মার্চ সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণার মুহূর্ত থেকে ১৬ই মে ফল প্রকাশের আগে পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের নির্ধারিত নির্বাচনী আচরণবিধি কার্যকর ছিল।

'Press Information Bureau' এর তথ্য অনুযায়ী ১৯৬০ সালে কেরালার বিধানসভা নির্বাচনে প্রথম একটি নির্বাচনী আচরণবিধি প্রয়োগ করা হয়। এটি ছিল রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী জনসভা, বক্তৃতা, স্লোগান সম্পর্কিত কিছু বিধিনিষেধ। এরপর ১৯৬২ সালে লোকসভা নির্বাচনে প্রথম সার্বজনীন ভাবে সারা দেশে নির্বাচনী আচরণবিধি প্রয়োগ করা হয়। পরবর্তীকালে ১৯৭৯ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময় 'ক্ষমতাসীন দল' সম্পর্কিত কিছু নির্দেশ নির্বাচনী আচরণবিধিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ক্ষমতাসীন দল যাতে নির্বাচনের সময় কোন অতিরিক্ত সুবিধা নিতে না পারে তার জন্য এই ব্যবস্থা। ২০১৩ সালে সুপ্রিম কোর্ট নির্বাচনী ইস্তেহার সম্পর্কিত নির্দেশাবলী নির্বাচনী আচরণবিধির অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কমিশনকে নির্দেশ দেয়। সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশ অনুসারে কমিশন ২০১৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময় নির্বাচনী ইস্তেহার সম্পর্কিত নির্দেশাবলী নির্বাচনী আচরণবিধির অন্তর্ভুক্ত করে।

নিম্নে নির্বাচনী আচরণবিধির মূল বিষয়গুলি তুলে ধরা হল-

সাধারণ ব্যবস্থাপনা :

প্রথমত, রাজনৈতিক দলগুলি প্রতিপক্ষের নীতি ও কর্মসূচী কিংবা অতীত কার্যকলাপের সমালোচনা করতে পারবে। তবে তার নির্দিষ্ট একটি গন্ডি থাকবে। অপ্রমাণিত কোন তথ্যের ভিত্তিতে কোন দল বা কোন দলীয় প্রার্থীকে সমালোচনা করা যাবে না। তাছাড়া কোন প্রার্থীর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে অপমানকর মন্তব্য বা সমালোচনা করা চলবে না।

Scanned with CamScanner

দ্বিতীয়ত, জাতপাত বা সম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে ভোটদাতাদের ভোটদানে উৎসাহিত করা যবে না। তৃতীয়ত, ভোট নিজের পক্ষে আনতে জনগণের মধ্যে অর্থ বিলি করা বা ঘুষ দেওয়া যাবে না। চতুর্থত, কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত রাজনৈতিক মতামতের জন্য তার বাড়ীর সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন বা পিকেটিং করা চলবে না।

জনসভা বা দলীয় সভা : প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে তাদের সম্ভাব্য সভা অনুষ্ঠানের তারিখ, সময় ও স্থান সম্পর্কে যথেষ্ট আগে থেকে স্থানীয় পুলিশকে জানিয়ে রাখতে হবে যাতে তারা সংশ্লিষ্ট স্থানে সভার পর্যাপ্ত নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে পারে।

দলীয় মিছিল : যদি দুই বা ততোধিক প্রার্থী একই পথে মিছিল বের করার পরিকল্পনা করে থাকে তাহলে এই মিছিলের ব্যবস্থাপকদের এটা সুনিশ্চিত করতে হবে যে তাদের মধ্যে কোন সংঘাত ঘটবে না। এবং তারা ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলবে। মিছিল করার সময় কর্তব্যরত পুলিশের নির্দেশাদি মান্য করতে হবে। অন্য কোন দলীয় প্রার্থীর কুশপুত্তলিকা দাহ করা চলবে না।

ভোটের দিন : প্রত্যেক ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের যে প্রতিনিধিরা থাকেন তাঁদের অবশ্যই পরিচয় পত্র থাকবে যেখানে তাঁদের নাম বা তাঁদের দলীয় প্রতীক থাকবে; তবে কোন দলের নাম সেখানে থাকবে না।

ভোট, গ্রহণ কেন্দ্র : কেবলমাত্র ভোটার ও নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে প্রবেশের বৈধ অনুমতি পত্র পাওয়া ব্যক্তিরাই ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের মধ্যে থাকতে পারবে।

পরিদর্শক: নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের সময় যে পরিদর্শক নিয়োগ করে যেকোন প্রার্থী তাঁদের কাছে নির্বাচন সংক্রান্ত যেকোন সমস্যা সম্পর্কে অভিযোগ করতে পারবেন।

ক্ষমতায় থাকা দল : ১৯৭৯ সালে নির্বাচনী আচরণবিধিতে নির্বাচনের সময় শাসক দলের প্রতি কিছু নির্দেশ বা অন্য কথায় বিধি-নিষেধ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যেমন, নির্বাচনের সময় ক্ষমতাসীন দল নিজ দলীয় কাজে সরকারী যানবাহন ব্যবহার করতে পারবে না। ক্ষমতাসীন দল নিজের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে সরকারী অর্থে বিজ্ঞাপন দিতে বা সরকারী প্রচার মাধ্যমগুলিকে ব্যবহার করতে পারবে না। কোন মন্ত্রী ও অন্য কোন কর্তৃপক্ষ নির্বাচনের সময় কোন প্রকল্পের শিলান্যাস কিংবা কোনও ধরনের কর্মসূচী ঘোষণা করতে পারবে না; এমনকি রাস্তাঘাট নির্মাণ বা পানীয় জল সরবরাহ করার কোন প্রতিশ্রুতি প্রদান করতে পারবে না। সরকারী অতিথিশালায়, বিশ্রামাগার ইত্যাদি সব দল বা প্রার্থী সমান ভাবে ব্যবহার করতে পারবে। ক্ষমতাসীন দল যাতে নির্বাচনের সময় ভোটদাতাদের নিজেদের অনুকূলে প্রভাবিত করতে না পারেন সে জন্য এই নিয়ম করা হয়েছে।

নির্বাচনী ইস্তেহার : ২০১৩ সালে এই নির্দেশাবলী যুক্ত করা হয়। নির্বাচনী ইস্তেহারে মক দেওয়ার জন্য এমন কোন প্রতিশ্রুতি জনগণের উদ্দেশ্যে দেওয়া যাবে না যা

বাস্তবে প্রয়োগ করা সম্ভবই নয়। প্রতিশ্রুতি কিভাবে বাস্তবে রূপ দেওয়া যাবে সে ব্যাপারে ইস্তেহারে স্পষ্ট উপায়ের উল্লেখ করতে হবে।

নির্বাচনী ব্যয় সংক্রান্ত আচরণবিধি :

১৯৬৬ সালে ৪ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্ট একটি ঐতিহাসিক রায় প্রদানের মধ্য দিয়ে জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ৭৭ নং ধারাকে সুস্পষ্ট ভাবে ব্যাখ্যা করে; যে ধারা বলে রাজনৈতিক দল বা প্রার্থীর ভোটের সময় করা যাবতীয় খরচাপাতির উপর কমিশন নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। উপরন্তু এই রায়দানের ফলে কমিশন ভোটে অর্থের অপব্যবহার হোল কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে পারে এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারে। এই আচরণবিধির মূল বিষয়গুলি হল-

প্রথমতঃ কমিশন প্রার্থীর নির্বাচনী ব্যয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করে দেবে।

দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক রাজনৈতিক দল নির্বাচনের সময় যে অর্থ ব্যয় করছে তার পূর্ণ হিসাব কমিশনকে দিতে হবে। এই হিসাবের বিবরণ ঠিকঠাক পদ্ধতিতে তৈরী করতে হবে এবং তা কমিশনের স্বীকৃত প্রতিনিধির থেকে সাক্ষরিত হতে হবে।

তৃতীয়তঃ নির্বাচনের সময় প্রত্যেকটি দলের ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্সের যাবতীয় হিসাব দিতে হবে।

চতুর্থতঃ 'Reveneu Secretary'-কে জাতীয় ও রাজ্যস্তরের প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের 'status position' জমা দিতে হবে।

পঞ্চমতঃ কোন রাজনৈতিক দলের বা কোন প্রার্থীর আয় ব্যয়ের পরীক্ষা পূর্ণ অধিকার কমিশন কর্তৃক ব্যয় পরিদর্শকের থাকবে।[১২]

উল্লেখ ১৯৮৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে কমিশন এই প্রস্তাব দেন যে লোকসভার একজন প্রার্থী নিজে সর্বোচ্চ ২ লাখ ১০ হাজার টাকা ও বিধানসভার একজন প্রার্থী সর্বাধিক ৭৫ হাজার টাকা খরচ করতে পারবেন। ২০১৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে বলা হয় বড় রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে একজন প্রার্থী সর্বাধিক ৭ মিলিয়ন অর্থ এবং ছোট রাজ্যগুলি ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির ক্ষেত্রে একজন প্রার্থী সর্বাধিক ৫.৪ মিলিয়ন অর্থ খরচ করতে পারবে।

নির্বাচনী সংস্কার :

সমগ্র দেশে অবাধ, স্বাধীন, শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা নির্বাচন কমিশনের প্রধান দায়িত্ব, আর এই দায়িত্ব কমিশন ১৯৫১ সাল থেকে বহন করে চলেছে। যখন এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি নিজেদের গণতান্ত্রিক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হিমসিম খাচ্ছে তখন পৃথিবীর এই বৃহত্তম গণতন্ত্র এক অর্থে সফল বলা যেতেই পারে; এখনও পর্যন্ত ভারতে মোট ষোলটি লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে (১৯৫১-৫২

১৯৫৭, ১৯৬২, ১৯৬৭, ১৯৭১, ১৯৭৭, ১৯৮০, ১৯৮৪, ১৯৮৯, ১৯৯১, ১৯৯৬, ১৯৯৮, ১৯৯৯, ২০০৪, ২০০৯ এবং ২০১৪)। কিন্তু এই নির্বাচন পরিচালনা করতে গিয়ে নির্বাচন কমিশনকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বাধা ও আইনী জটিলতার মধ্যে পড়তে হয়েছে। যার জন্য বিভিন্ন সময় নির্বাচনী আইনের সংস্কার সাধনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এ ব্যাপারে বিভিন্ন কমিশনের রিপোর্ট গুরুত্বপূর্ণ; যেমন- তারাকুন্ড কমিটির রিপোর্ট (১৯৭৫), দিনেশ গোস্বামী কমিটির রিপোর্ট (১৯৯০), ইন্দ্রজিৎ গুপ্তা কমিটির রিপোর্ট (১৯৯৮), ভারতের আইন কমিশনের রিপোর্ট (১৯৯৯), N.C.R.W.C. (National Commission to Review the working of the Constitution) (2001) এর রিপোর্ট প্রভৃতি। এই নির্বাচনী সংস্কার আসলে ব্যাপক গবেষণার বিষয়; তবে ব্যাপক পর্যবেক্ষণ, আইনী পরীক্ষা নিরীক্ষা প্রভৃতির ভিত্তিতে সংস্কার রিপোর্ট তৈরী করা হলেও, এর প্রয়োগের বিষয়টি অত্যন্ত সীমিত। যাইহোক নিম্নে বিভিন্ন কমিটি বা কমিশনের সুপারিশগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল।

তারাকুন্ডে কমিটি (১৯৭৪-৭৫) :

১৯৭৪ সালে ভিথাল মহাদেও তারাকুন্ডের সভাপতিত্বে জয়প্রকাশ নারায়ণ নির্বাচন সংস্কার সংক্রান্ত কমিটি গঠন করেন। ১৯৭৫ সালে কমিটি তার রিপোর্ট দেয়। কমিটি মনে করে নির্বাচন কমিশন কেবল খাতায় কলমে স্বচ্ছ ও নিরপক্ষে হবে না, বাস্তবে তা প্রয়োগ করে দেখতে হবে। কমিটি যে সমস্ত সুপারিশ করে তা হল-

প্রথমতঃ নির্বাচন কমিশনারদের নির্বাচিত করতে একটি পৃথক কমিটি গঠন করা জরুরী; যে কমিটিতে থাকবেন প্রধানমন্ত্রী, লোকসভার বিরোধী দলের নেতা এবং ভারতের প্রধান বিচারপতি। সংশ্লিষ্ট কমিটির সুপারিশে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করবেন। আঞ্চলিক নির্বাচন কমিশনার একটি বা একাধিক রাজ্যের জন্য মনোনীত হবেন। তিনি নির্বাচনের সময় প্রয়োজনীয় বিভিন্ন আধিকারিক নিয়োগ করবেন। আঞ্চলিক নির্বাচন কমিশনারের পদ স্থায়ী প্রকৃতির করার কথা কমিটি সুপারিশ করে।

দ্বিতীয়তঃ সরকারী সম্পত্তি যাতে অপব্যবহার না হয় তার জন্য কমিটি সুপারিশ করে যে, লোকসভা বা বিধানসভা ভেঙে গেলে নির্বাচনের দিন ঘোষণার পর থেকে নির্বাচনের ফল প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত পূর্বের সরকার অবধায়ক সরকার হিসাবে দায়িত্ব পালন করবে। তবে এই পর্বে সরকার কোন নতুন নীতি প্রণয়ন, কোন নতুন পরিকল্পনা বা প্রতিশ্রুতি দেওয়া, ভাতা বা বেতন বাড়ানো প্রভৃতি করতে পারবেন না। মন্ত্রীরা সরকারী টাকায় কোথাও ভ্রমণ করতে পারবে না। নির্বাচনের সময় কোন প্রধান আরক্ষীকের উপরিস্তরের পুলিশ আধিকারিককে অথবা প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের পুলিশ আধিকারিকদের বদলি করা যাবে না।

তৃতীয়তঃ বেতার ও দূরদর্শনকে কোন স্বাধীন সংস্থার অধীনে স্থাপন করা দরকার।

চতুর্থতঃ লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলির অর্থ ব্যয়ের যে সীমা নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে তা দ্বিগুণ করা দরকার। বিভিন্ন কোম্পানী রাজনৈতিক দলগুলিকে অর্থ সাহায্য করার ক্ষেত্রে কোন বাধা থাকার দরকার নেই। নির্বাচনে টাকার খেলা বন্ধ করতে কমিটি কিছু সুপারিশ করে। সমস্ত স্বীকৃত রাজনৈতিক দল তাদের আয়-ব্যয় সম্পর্কে রিপোর্ট কমিশনকে দেবে। শুধু তাই নয় এই হিসাব পরীক্ষা করবে নির্বাচন কমিশন স্বীকৃত কোন সনন্দ দ্বার প্রতিষ্ঠিত হিসাব পরীক্ষক সমিতির সভ্য (Chartered Accountant)। কোন মিথ্যা বা ভুল তথ্য থাকলে কমিশন সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে আইনী পদক্ষেপ নিতে পারবে।

পঞ্চমতঃ 'Security deposite' লোকসভার ক্ষেত্রে ১০০০০ টাকা ও বিধানসভার ক্ষেত্রে ৩০০০ টাকা (তফসিলীদের ৫০% ছাড় থাকবে) করা দরকার।

ষষ্ঠতঃ কমিটি একটি বিকল্প প্রতিনিধিত্বের কথা ভেবে ছিল। কমিটি এক্ষেত্রে জার্মান তালিকা পদ্ধতিকে সুপারিশ করেছিল (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মান একটি নতুন নির্বাচনী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল যাকে বলা হয় Personalized proportional ব্যবস্থা। এখানে প্রত্যেক ব্যক্তির দুটি করে ভোট থাকবে। পার্লামেন্ট নির্বাচনের সময় অর্ধেক আসন পূরণের জন্য কোন নির্দিষ্ট প্রার্থীকে জনগণ তার প্রথম ভোটটি দেবেন। এই ক্ষেত্রে যে প্রার্থী বেশি ভোট পাবেন তিনি সরাসরি নির্বাচিত হবেন। বাকি অর্ধেক আসন পূরণের জন্য জনগণ কোন নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলকে তাদের দ্বিতীয় ভোটটি দেবেন। এই দ্বিতীয় ভোট ঠিক করে দেবে যে কোন রাজনৈতিক দল থেকে কতজন প্রতিনিধি পার্লামেন্টে যাবে।)[১৩]

দিনেশ গোস্বামী কমিটি (১৯৯০-৯৬) :

১৯৯০ সালে ভি. পি. সিং এর নেতৃত্বাধীন জাতীয় ফ্রন্ট সরকার নির্বাচনী সংস্কারের জন্য দিনেশ গোস্বামীর সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটি ১৯৯৬ সালের তার রিপোর্ট জমা দেয়। কমিটি এ ব্যাপারে যে সমস্ত সুপারিশ করেছিল সেগুলি হল-

প্রথমত :- নির্বাচন কমিশন একাধিক সদস্য বিশিষ্ট হবে।

দ্বিতীয়ত :- নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজনৈতিক দল ও জনগণের উদ্দেশ্যে একটি আচরণবিধি তৈরী করা দরকার।

তৃতীয়ত :- একজন প্রার্থী দুটির বেশী নির্বাচনী ক্ষেত্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না।

চতুর্থত :- Security deposite লোকসভার ক্ষেত্রে প্রার্থীর ১০০০ থেকে বাড়িয়ে ১০০০০ টাকা করা হবে এবং তফসিলী জাতি ও উপজাতিদের ক্ষেত্রে ৫০০ থেকে

Scanned with CamScanner

বাড়িয়ে ৫০০০ টাকা করা হবে। ঠিক তেমনি বিধানসভার ক্ষেত্রে একজন প্রার্থীর ২৫০ থেকে বাড়িয়ে ৫০০০ টাকা করা হবে এবং তফসিলী জাতি ও উপজাতিদের ক্ষেত্রে ১২৫ থেকে বাড়িয়ে ২৫০০ টাকা করা হবে।

পঞ্চমত :- প্রত্যেকটি দলের আয়-ব্যয়ের হিসাব সঠিক ভাবে দেখাতে হবে। তাছাড়া নির্বাচনী ব্যয়ের একটি সীমা বেঁধে দেওয়া প্রয়োজন। কোন কোম্পানীর কাছ থেকে কোন দল আর্থিক সাহায্য নিতে পারবে না।

ষষ্ঠত :- সচিত্র ভোটার তালিকা প্রস্তুত এবং সারা দেশে সচিত্র ভোটার পরিচয় পত্র প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

সপ্তমত :- নির্বাচনী প্রচারের সময় ২০ দিন থেকে কমিয়ে ১৪ দিন করা দরকার।

অষ্টমত :- প্রার্থীদেরকে তিনটি তালিকায় ভাগ করতে হবে। প্রথম তালিকায় থাকবে সুপরিচিত রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা, দ্বিতীয় তালিকায় থাকবে নতুন গঠিত বা সাংগঠনিক দিক থেকে অত্যন্ত দুর্বল রাজনৈতিক দলের প্রার্থী এবং শেষ তালিকায় থাকবে অন্যান্য স্বাধীন প্রার্থীগণ (নির্দল)।

নবমত :- নির্বাচনী বিতর্ক বা সমস্যা মেটাতে একটি পৃথক স্বাধীন Tribunal গঠন করতে হবে।

দশমত :- শুধুমাত্র Returning Officer এর রিপোর্টের ভিত্তিতে কোথাও পুনর্নির্বাচনের ব্যবস্থা কমিশন করবে না এর পাশাপাশি কমিশন নিজের মত করে তদন্ত কমিশন গঠন করে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে।

একাদশতম :- তালিকা পদ্ধতির সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নীতির ভিত্তিতে ভোট হওয়া উচিত।

দ্বাদশতম :- যে সমস্ত সরকারী কর্মচারী নির্বাচনের কাজে নিয়োজিত তাদের জন্য Proxy ভোটের ব্যবস্থা করতে হবে।

ত্রয়োদশতম :- নির্বাচনে E.V.M ব্যবহার করা উচিত। [১৪]

ভোরা কমিটি (১৯৯৩) :

নির্বাচনী অপরাধ সংক্রান্ত বিষয়ে, বিশেষ করে ক্রিমিনাল এবং জনপ্রতিনিধি ও আমলাদের মধ্যে যোগসাজস সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহের ভার দেওয়া হয়েছিল হোম সেক্রেটারি এন.এন.ভোরা-র নেতৃত্বে একটি কমিটির উপর। কমিটি ১৯৯৩ সালের অক্টোবর মাসে তার রিপোর্ট জমা দেয়। যদিও রিপোর্টের কিছু অংশ প্রকাশ করা হয়নি। এই কিমটি তার রিপোর্টে বহু বিস্ফোরক অভিযোগ করেছে। তাঁদের দাবী সরকারি প্রশাসনের সমান্তরালে একটি ক্রিমিনাল নেটওয়ার্কও তাদের নিজস্ব প্রশাসন চালিয়ে যাচ্ছে। রিপোর্টে ক্রিমিনাল গ্যাং-এর কথা বলা হয়েছে, যে সমস্ত গ্যাং রাজনীতিবিদদের

ছত্র-ছায়ায় বহাল তবিয়তে তাদের কাজ করে চলেছে। শুধু তাই নয় এই রিপোর্টে দাবী করা হচ্ছে রাজনীতিক নেতারা ধীরে ধীরে এই সব গ্যাং-এরও নেতা হয়ে উঠেছে। বহু বছর ধরে দেখা যাচ্ছে পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে লোকসভা নির্বাচনে ক্রিমিনালরা জয়ী হচ্ছে।

কমিটির মতে রিয়ালেস্টেট এবং সিন্ডিকেট শহরে একটি গুরুত্বপূর্ণ আয়ের উৎস। জোর করে জমি দখল কিংবা কম দাম দিয়ে ভয় দেখিয়ে জমি বা বাড়ি কেনা, বহুতল বেআইনি ভাবে বিক্রি প্রভৃতির সাথে যুক্ত দালালদের সাথে রাজনীতিবিদ ও আমলাদের যোগসাজস থাকে, কারণ এদের দৃষ্টি এড়িয়ে এই ধরনের অপরাধ করা সম্ভব নয়। এই 'Money Power' শেষ পর্যন্ত পেশি শক্তির জন্ম দিচ্ছে যা নির্বাচনের সময় রাজনীতিবিদরা ব্যবহার করছে। দুষ্কৃতিদের সাথে পুলিশ, রাজনীতিবিদ ও আমলাদের ঘনিষ্ট সম্পর্কের কথা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশ্যে এসেছে। কোন ব্যক্তি বিশেষ অপরাধ করলে তার শাস্তি দেওয়ার মত শক্তিশালী আইন থাকলেও এই মাফিয়া গোষ্ঠীকে দমন করার মত শক্তিশালী আইন এখনও তৈরী হয়নি বা হলেও আদালতের ভূমিকা এ ব্যাপারে খুব দুর্বল। এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে অনেক সময় বিভিন্ন মাফিয়া 'Boss' এর উত্থান ঘটে যাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার মত ক্ষমতা প্রশাসনের থাকে না। এই সমস্ত মাফিয়াদের আবার আন্তর্জাতিক যোগাযোগও থাকে।

ভোরা কমিটির সমস্ত রিপোর্ট প্রকাশ না করার কারণ এর থেকে অনুমান করা যেতেই পারে। যাই হোক ১৯৯৭ সালে সুপ্রিম কোর্ট ভোরা কমিটির রিপোর্টে যেসব অভিযোগ করা হয় সে ব্যাপারে তদন্ত করার জন্য একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করার নির্দেশ দিয়েছিল। [১৫]

ইন্দ্রজিৎ গুপ্তা কমিটি (১৯৯৮-৯৯) :

১৯৮৯ সালে এন.ডি.এ সরকার নির্বাচনী সংস্কারের জন্য ইন্দ্রজিৎ গুপ্তার সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটি ১৯৯৯ সালে তার রিপোর্ট জমা দেয়। কমিটির সুপারিশের প্রধান বিষয় ছিল State Funding Election। অস্বীকার করা যাবে না যে, টাকা ছাড়া নির্বাচন করা যাবে না; কিন্তু তার পাশাপাশি এটাও লক্ষ্য রাখতে হবে যে টাকা যেন নির্বাচনকে নিয়ন্ত্রণ না করে। অর্থাৎ, ধনীরাই কেবল নির্বাচনে দাঁড়াতে পারবে এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে হাইজ্যাক করে নেবে এটা হতে দেওয়া যায় না। সেই কারণে আইন করে নির্বাচনী খরচের একটা উর্দ্ধসীমা বেঁধে দেওয়া প্রয়োজন। এটা বলা হয়ে থাকে যে 'State Funds'-কে ব্যবহার করা হয় জনকল্যাণ ও সাধারণের অর্থে। নির্বাচনী খরচাপাতির জন্য রাজনৈতিক দলগুলিকে যদি সরকার অনুদান দেয় তাহলে দলগুলিকে ঐ সমস্ত কর্পোরেট হাউসগুলির কাছে নির্ভর থাকতে হবে না এবং তার ফলে তারা কর্পোরেট হাউসগুলির স্বার্থের পরিবর্তে সাধারণ জনগণের স্বার্থের দিকে

Scanned with CamScanner

নজর দিতে পারবে। এর ফলে আর্থিক দিক থেকে দুর্বল রাজনৈতিক দলগুলিও নির্বাচনে সমান সুযোগ সুবিধা পাবে।[১৭] 'State Funding Eelction' সাধারণত তিন ধরনের হয়ে থাকে —

Minimalist Pattern :	এই ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলিকে ন্যূনতম সরকারি সাহায্য করা হয়। ব্রিটেন, আয়ারল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও কানাডাতে এই ব্যবস্থা প্রচলিত।
Maximalist Pattern :	শুধু নির্বাচনের সময় নয় অন্যান্য সময়েও রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন কাজে সরকারি সাহায্য করা হয়। সুইডেন ও জার্মানীতে এই ধরনের ব্যবস্থা প্রচলিত।
Mixed Patern :	এই ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলিকে আংশিক সাহায্য প্রাদন করা হয়। ফ্রান্স, নেদারল্যান্ড ও সাউথ কোরিয়াতে এই ধরনের ব্যবস্থা প্রচলিত।

ভারতের আইন কমিশনের রিপোর্ট (১৯৯৯) ঃ

ভারতের আইন কমিশন ১৯৯৯ সালে তাদের রিপোর্টে ইন্দ্রজিৎ গুপ্তা কমিটির সঙ্গে একমত হন। সরকারী অর্থে নির্বাচনী প্রচারে ব্যবস্থা প্রবর্তনই কাম্য বলে কমিশন অভিমত প্রকাশ করে। তবে অন্য কোনও সূত্র থেকে রাজনৈতিক দলগুলি তহবিল তুলতে পারবে না- এই শর্তে এটা হওয়া উচিত বলে কমিশন বলে মনে করেন। তবে কমিশন এর পাশাপাশি এও সুপারিশ করে যে সরকারী অর্থে নির্বাচনী প্রচারের ব্যয় নির্বাহের চেষ্টা করার আগে রাজনৈতিক দলগুলির জন্য যথোপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন। কমিশন একটি বিকল্প নির্বাচন ব্যবস্থার উপর জোর দিয়েছেন। কমিশনের মতে এই নতুন ব্যবস্থায় কোন ব্যক্তি ৫০% এর কম ভোট পেলে তাকে নির্বাচিত করা যাবে না। তাছাড়া ব্যালট পেপারে নেতিবাচক ভোট প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে। অর্থাৎ কোন নির্বাচনী ক্ষেত্র প্রতিদ্বন্দ্বী কোন প্রার্থীকে পছন্দ না হলে ব্যালট পত্রে এই অপছন্দ জানানোর ব্যবস্থা থাকবে এবং এই নেতিবাচক ভোটকে ভোট গণনার সময় বিবেচনার মধ্যে রাখা হবে। তবে যদি কোন প্রার্থী ন্যূনতম ৫০% ভোট না পায় তাহলে সব থেকে বেশী ভোট পেয়েছে এমন দুটি রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের মধ্যে একটা Runoff Election অনুষ্ঠিত করা হবে। এখানেও নেতিবাচক ভোটের ব্যবস্থা থাকবে। যদি এই নির্বাচনেও কোন প্রার্থী ৫০% এর বেশী ভোট না পায় তাহলে ঐ নির্বাচনী ক্ষেত্রে পুনরায় নতুন করে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা হবে।

কমিশন এর বক্তব্য হল এর মধ্য দিয়ে বর্তমান নির্বাচন ব্যবস্থার দুটি গুরুতর সমস্যাকে কমানো যাবে। প্রথমত, কোন নির্বাচনী ক্ষেত্রে কোন 'জাতি'-র (Caste)

মানুষ ৫০% থাকে না। ফলে ভোট দেওয়ার সময় 'জাতি' (Caste).কোন ভাবে প্রভাব ফেলবে না। দ্বিতীয়ত, নেতিবাচক ভোট রাজনৈতিক দলগুলির উপর নৈতিক চাপ তৈরী করবে যার ফলে রাজনৈতিক দলগুলি কোন দাগি অপরাধী বা দুর্নীতিগ্রস্থ কোন ব্যক্তিকে নির্বাচনে টিকিট দেবে না।[১৮]

ভেঙ্কটাচালিয়া কমিশন (২০০০) ঃ

২০০০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে N.D.A সরকার সংবিধান পুনঃপর্যালোচনা করার জন্য এম.এন. ভেঙ্কটাচালিয়ার নেতৃত্বে ১১ সদস্য বিশিষ্ট ভেঙ্কটাচালিয়া কমিশন গঠন করেন। কমিশন নির্বাচনী ব্যবস্থার বিবিধ সমস্যা চিহ্নিত করে কতকগুলি সংস্কারের সুপারিশ করে। কমিশনের রিপোর্টে ৩৬টি সুপারিশ ছিল। এগুলি নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

প্রথমত :- পঞ্চায়েত স্তর থেকে লোকসভা পর্যন্ত সমস্ত নির্বাচনে ভোটার তালিকা প্রস্তুত করার একটি সুষ্ঠ পদ্ধতির কথা সুপারিশ করে এবং এর পাশাপাশি ভোটার পরিচয় পত্রের কথা উল্লেখ করা হয় যার ভোট ছাড়াও অন্যান্য বহু ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।

দ্বিতীয়ত :- কমিশন দেশের সমস্ত জায়গায় যত দ্রুত সম্ভব ইলেকট্রনিক ভোট যন্ত্র (EVMs) ব্যবহার করার কথা সুপারিশ করে।

তৃতীয়ত :- বুথ দখল ও রিগিং এর ব্যাপারে কমিশন পূর্বের দীনেশ গোস্বামী কমিটির রিপোর্টকে স্বাগত জানিয়েছে, যে রিপোর্ট বুথ দখল ও রিগিং বন্ধ করতে কমিশনের হাতে আরও বেশী ক্ষমতা থাকার কথা বলা হয়েছিল।

চতুর্থত :- কমিশন মনে করে যে, জাত-পাত বা সাম্প্রদায়িক ভিত্তিক নির্বাচনী প্রচার আইনত দন্ডনীয় বা বাধ্যতামূলক কারাদন্ড ভোগ করতে হবে। যদি কোন প্রার্থীকে নির্বাচনী প্রচারে এমন বক্তব্য করতে দেখা যায় তাহলে তৎক্ষণাৎ তার প্রার্থীপদ বাতিল করতে হবে।

পঞ্চমত :- নির্বাচনে দুর্বিত্তায়নের প্রবেশ রুখতে জনপ্রতিনিধিত্ব আইন ১৯৫১ এর সংস্কারের প্রয়োজন আছে বলে কমিশন মনে করে। কমিশনের মতে (ক) যদি কোন ব্যক্তিকে আদালত ৫ বছর বা তার বেশি সময়ের জন্য কারাদন্ড দেয় তাহলে সে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না। এবং যদি কোন সাংসদ বা বিধায়ক অভিযুক্ত হন তাহলে অভিযুক্ত হওয়ার দিন থেকে বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর সদস্যপদ বাতিল হবে। (খ) যদি কোন ব্যক্তি খুন, ডাকাতি, ধর্ষণ প্রভৃতির মত ঘৃণ্য অপরাধে অভিযুক্ত হবেন তিনি সারা জীবনের জন্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার যোগ্যতা হারাবেন। (গ) রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে মামলা দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তি করতে হবে। প্রয়োজনে কোর্টের জন্য পৃথক বেঞ্চ গঠন করার সুপারিশ কমিশন করেছে।

Scanned with CamScanner

ষষ্ঠত :- নির্বাচন করতে গেলে অর্থের প্রয়োজন। খরচের সীমাও কমিশন আইন করে ঠিক করে দিয়েছে। কিন্তু যেটা বলা হয়েছে আর যেটা বাস্তবে হচ্ছে তার মধ্যে আসমান-জমিন ফারাক থাকায় সেই ফাঁকে দুর্নীতি খুব সহজেই প্রবেশ করেছে। কমিশনের মতে "*Electoral compulsions for funds become the foundation of the whole super structure of corruption.*" কমিশনের মতে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের পাশাপাশি প্রার্থীকে ব্যক্তিগত ভাবে খরচের পুঙ্খানুপুঙ্খ রিপোর্ট নির্বাচন কমিশনের কাছে জমা দিতে হবে। তাছাড়া প্রত্যেক প্রার্থীকে নির্বাচনের প্রাক্কালে তাঁর এবং তাঁর নিকট আত্মীয়ের সম্পত্তির হিসাব প্রকাশ করতে হবে।

সপ্তমত :- রাস্তার উপর উচ্চস্বরে প্রচার, পথসভার ফলে যান-জট প্রভৃতি ঠিকঠাক ভাবে পরিচালনা করতে হবে। কমিশন প্রচারের দিন কমিয়ে আনার পক্ষপাতী।

অষ্টমত :- কমিশন 'First Past the Post System' এর সীমাবদ্ধতা গুলি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে। কমিশনের মতে এই ব্যবস্থায় কোন প্রার্থী অধিকাংশ ভোট না পেয়েও জয়লাভের সুযোগ থাকে। কমিশন খুব দৃঢ় ভাবে মনে করেন কোন প্রার্থীকে জয়ী হতে হলে তাকে অবশ্যই ৫০% এর বেশি ভোট পেতে হবে। কমিশন এক্ষেত্রে একটি 'Run-off contest' এর ভাবনাচিন্তা করেছেন।

নবমত :- কমিশনের মতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়োগ করতে একটি কমিটি থাকা জরুরী, যে কমিটিতে থাকবেন প্রধানমন্ত্রী, লোকসভা বা রাজ্যসভার বিরোধী দলের নেতা, লোকসভার স্পিকার এবং রাজ্যসভার সভাপতি বা উপরাষ্ট্রপতি।

দশমত :- প্রত্যেক প্রার্থীকে নির্বাচনে মনোনয়ন জমা দেওয়ার আগে সরকারী সমস্ত ঋণ মুকুব করে দিতে হবে।

একাদশতম :- সরকারী দপ্তরে কর্মরত কোন ব্যক্তি নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না। যদি তিনি প্রার্থী হতে চান তাহলে তাঁকে আগে সংশ্লিষ্ট পদ ছাড়তে হবে।[১৮]

সংবিধান বিষয়ক জাতীয় পর্যালোচনা কমিশন N.C.R.W.C. (National Commission to Review the working of the Constitution) 2001 :

সুভাষ কাশ্যপের নেতৃত্বে এবং আর.কে. ত্রিবেদীর সভাপতিত্বে এই কমিশন গঠন করা হয়। কমিশন পূর্বের বিভিন্ন কমিশনের রিপোর্ট পর্যালোচনা করে কিছু সংস্কারের নির্দেশ দেয়।[১৯]

প্রথমত :- কমিশন গান্ধিবাদী বিকেন্দ্রীকরণের নীতিকে স্বীকৃতি দিয়ে পঞ্চায়েত ও নগর পালিকায় প্রত্যক্ষ নির্বাচন এবং জেলা পরিষদে পরোক্ষ নির্বাচনের সুপারিশ করে।

দ্বিতীয়ত :- কমিশন দেশের সমস্ত সাধারণ নির্বাচনে E.V.M ব্যবহার করার সুপারিশ করে।

তৃতীয়ত :- কমিশন সুপারিশ করে যে যদি কোন প্রার্থী নির্বাচনী প্রচারে এমন কোন বক্তব্য রাখেন যা কোন সম্প্রদায়ের ভাবাবেগে আঘাত করে তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা কমিশন গ্রহণ করবে।

চতুর্থত :- কমিশন ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ৭৭(১) নং ধারাকে বাতিলের সুপারিশ করে; যে ধারা অনুসারে প্রার্থী এবং তার প্রতিনিধি ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি নির্বাচনে যদি কোন অর্থ খরচ করে তাহলে সেটা নির্বাচনী ব্যয় বলে গণ্য হত না।

পঞ্চমত :- প্রত্যেক প্রার্থীকে নির্বাচনের সময় তার নিজের এবং তার নিকট আত্মীয়ের সম্পত্তির খুঁটি-নাটি হিসেব দাখিল করতে হবে। আইনই বলে দেবে নিকট আত্মীয় বলতে কাকে বোঝানো হবে।

প্রধানমন্ত্রীকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের নির্বাচন সংস্কার সংক্রান্ত চিঠি (২০০৪):

তৎকালীন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার টি. এস. কৃষ্ণমূর্তি প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-কে ২০০৪ সালের ৫ জুলাই একটি চিঠি লেখেন; যে চিঠিতে তিনি প্রধানমন্ত্রীকে কিছু নির্বাচনী সংস্কারের পরামর্শ দেন। নিম্নে এগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

প্রথমত :- নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার অন্ততপক্ষে ৬ মাস আগে যদি কোন ব্যক্তি আদালতে অভিযুক্ত হন তাহলে তিনি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার যোগ্যতা হারাবেন।

দ্বিতীয়ত :- মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় প্রার্থীর অপরাধ সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য জমা দিতে হবে।

তৃতীয়ত :- নির্বাচনে 'Security deposite' এর পরিমাণ বাড়ানো দরকার।

চতুর্থত :- নির্বাচন কমিশনের একটি স্বাধীন সচিবালয় গঠন করা প্রয়োজন।

পঞ্চমত :- নির্বচনের সময় নির্বাচন আধিকারিকদের ইচ্ছা মতো বদলি করা যাবে না, ইত্যাদি।[২০]

CPI(M) দলের পক্ষ থেকে নির্বাচনী সংস্কারের সুপারিশ (2006) :

২০০৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন পর্বে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে CPI(M) দলের পক্ষ থেকে আপত্তি তোলা হয় এবং তারা কমিশনের সংস্কারের ব্যাপারে জোরালো দাবী তোলে। তাদের মূল প্রশ্ন হল, নির্বাচন কমিশন কি এটা দাবী করতে পারে যে, বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন ভাবে নির্বাচন করা হবে। নির্বাচনী প্রচারের সময় নির্ধারণ, নির্বাচনের সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক কাজে বাধা নিষেধ, কেন্দ্রীয় পরিদর্শকের কার্যকলাপ কোনও প্রকার সম্যক পরীক্ষা ছাড়াই গ্রহণ; উদাহরণ স্বরূপ ২০০৬ সালে পশ্চিমবঙ্গে ৫টি পর্বে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে কমিশন ঘোষণা করে। কিন্তু সন্ত্রাস বিধ্বস্ত জম্মু-কাশ্মীরের ক্ষেত্রে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দিন ধার্য করা হয় ৪ দিন, আবার

Scanned with CamScanner

তামিলনাড়ুর ক্ষেত্রে ১ দিন, কেরালার ক্ষেত্রে ৩ দিন ধার্য করা হয়। CPI(M) এর বক্তব্যপত্রে একটি সাংবিধানিক কমিটি প্রতিষ্ঠার উপর জোর দেওয়া হল। নির্বাচন কমিশন কোন রাজনৈতিক দলকে অতিরিক্ত সুবিধা পাইয়ে দিচ্ছে কিনা, কমিশন সরকারী ক্ষমতা বলপূর্ব ব্যবহার করছে কিনা, অথবা কমিশনের কোন পদক্ষেপের পিছনে অসৎ উদ্দেশ্য আছে কিনা, ইত্যাদি নতুন এই সাংবিধানিক কমিটি খতিয়ে দেখবে। যদিও আমাদের সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কমিশনরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে CPI(M) দল অস্বীকার করেনি, তারা এই প্রতিষ্ঠানটিকে আরো শক্তিশালী ও সংহতি বজায় রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করে।[২১]

দ্বিতীয় প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন (2nd ARC) (2008) :

সামগ্রিক প্রশাসনিক ব্যবস্থার সংস্কারের উদ্দেশ্যে ভিরাপ্পা মেইলির সভাপতিত্বে ২০০৫ সালের ৩১শে আগস্ট দ্বিতীয় প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়। নির্বাচন সংস্কারের ব্যাপারে কমিশন ২০০৮ সালে যে সমস্ত সুপারিশগুলি করেছিল সেগুলি হল :

প্রথমত :- তারাকুন্ডে কমিটির মতই দ্বিতীয় প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন ও মনে করে নির্বাচন কমিশনারদের নির্বাচিত করতে একটি পৃথক কমিটি গঠন করা জরুরী।

দ্বিতীয়ত :- 'দ্বিতীয় প্রশাসনিক সংস্কার' কমিশন সুপারিশ করে যে, ৩২৩ (খ) এর অধীনে স্থানীয় স্তরে নির্বাচনী অপরাধের বিচার করতে বিশেষ নির্বাচনী ট্রাইবুন্যাল থাকা প্রয়োজন; যার উদ্দেশ্য হল দ্রুততার সাথে নির্বাচনী অপরাধের বিচারকার্য সম্পন্ন করা।

তৃতীয়ত :- 'দ্বিতীয় প্রশাসনিক সংস্কার' কমিশন জনপ্রতিনিধি আইনের সংস্কারের প্রয়োজন আছে বলে মনে করে। যাদের বিরুদ্ধে মারাত্মক ধরনের অভিযোগ (খুন, ধর্ষণ, ডাকাতি প্রভৃতি) আছে তাদেরকে নির্বাচনী প্রক্রিয়া থেকে সরিয়ে দিতে হবে। তবে এই অভিযোগ অবশ্যই নির্বাচনের অন্তত পক্ষে ৬ মাস আগে উঠতে হবে; নাহলে তাদের নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের অধিকার কাড়া যাবে না বলে কমিশন মনে করে।

চতুর্থত :- কমিশন ইন্দ্রজিৎ গুপ্তা কমিটির সুপারিশকে গুরুত্ব দিয়ে আংশিক 'State Funding Election' এর পক্ষে সওয়াল করে।[২২]

বিভিন্ন সময়ে নির্বাচন কমিশনের নির্বাচন সংস্কার সংক্রান্ত পদক্ষেপ :

উপরিউক্ত এই সমস্ত কমিটি/কমিশন ও বিভিন্ন সময় আদালতের বিভিন্ন রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন যেসব সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নিয়েছে তা সংক্ষেপে নিম্নে আলোচনা করা হল।

প্রথমত :- ১৯৮৮ সালের ৬১তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে ভোটদাতার সর্বনিম্ন বয়স ২১ থেকে ১৮ করা হয় এবং ভোটাধিকার প্রয়োগ সম্পর্কিত

যোগ্যতা-অযোগ্যতার বিষয়টি নির্ধারণ করা হয়।

দ্বিতীয়ত :- নির্বাচন কমিশনকে একাধিক সদস্য বিশিষ্ট করা হয়েছে। পূর্বে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়েই নির্বাচন কমিশন গঠন হত। কিন্তু বর্তমানে নির্বাচন কমিশন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ও অন্য দুইজন নির্বাচন কমিশনারকে নিয়ে তিন সদস্য বিশিষ্ট।

তৃতীয়ত :- ১৯৯৩ সাল থেকে নির্বাচন কমিশন প্রত্যেক নির্বাচককে সচিত্র পরিচয় পত্র দিতে শুরু করেছে।

চতুর্থত :- ২০০৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে এবং ধীরে ধীরে অন্যান্য আঞ্চলিক নির্বাচনে ব্যালট পত্রের বদলে ই.ভি.এম. ব্যবহার করা শুরু হয়।

পঞ্চমত :- ১৯৯৮ সাল থেকে নির্বাচন কমিশন ভারতের সকল নির্বাচকের তালিকাটি কম্পিউটারাইজড করা শুরু করে।

ষষ্ঠত :- ভোটারদেরকে ভোট প্রক্রিয়া সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে ২০০৯ সাল থেকে নির্বাচন কমিশন 'Systemetic Voter Education and Electoral Participation' (SVEEP) কর্মসূচী গ্রহণ করে। এছাড়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রতিটি নাগরিক যাতে ভোট দানে উৎসাহিত হন তার জন্য নির্বাচন কমিশন ব্যাপক প্রচারের কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত মানুষদের এই প্রচারের কাজে বিভিন্ন সময় সামিল করা হয়। যেমন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এ.পি.জে. আব্দুল কালাম, ভারতের ক্রিকেট টিমের অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি, টেনিস তারকা সাইনা নেহওয়াল প্রমুখ স্বনামধন্য ব্যক্তিদেরকে সামনে রেখে নির্বাচন কমিশন প্রচার চালিয়েছে।

সপ্তমত :- সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতি পর্ব থেকে ফল প্রকাশ পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায় যাতে পক্ষপাতহীন ও স্বচ্ছভাবে সম্পদিত হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য নির্বাচন কমিশন কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের অবজার্ভার এবং মাইক্রো অবজার্ভার হিসাবে নিয়োগ করে।

অষ্টমত :- ২০১৩ সালে সুপ্রিম কোর্ট রায় অনুসারে গুরুতর অপরাধে সাজাপ্রাপ্ত নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির প্রতিনিধিত্ব বাতিল হয়ে যাবে এবং পরবর্তী ১০ বছরের জন্য তাঁরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষেত্রে অযোগ্য পরিগণিত হবেন। এর ফলে রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন কিছুটা হলেও কমবে তা আশা করা যায়।

নবমত :- ২০১৩ সাল থেকে নির্বাচন কমিশন ই.ভি.এম.-এ 'নোটা' অর্থাৎ 'উপরের কেউ নন' বোতাম টিপে ভোটদাতারা প্রার্থীদের প্রতি তাঁদের অনাস্থা জানাতে পারবেন।

দশমত :- নির্বাচন দল বা কোন প্রার্থী সর্বোচ্চ কত খরচ করতে পারবে তার সীমারেখা কমিশন নির্ধারণ করে দেয়। বর্তমানে লোকসভা নির্বাচনে বড় রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে এই সীমা ২৫ লক্ষ টাকা এবং ছোট রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত রাজ্যের ক্ষেত্রে এই

Scanned with CamScanner

সীমা ১০ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষের মধ্যে বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

একাদশতম: - ব্যালট পেপার হীন নির্বাচনী ব্যবস্থায় বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্রের মাধ্যমে ভোট দেবার সঙ্গে সঙ্গে ভোট কোন প্রার্থীর পক্ষে পড়েছে সেই তথ্য (Voter Verfiable Paper Audit Trail বা VVPRT) এর মাধ্যমে ভোটদাতাদের জানানোর ব্যবস্থা ২০১৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে করা হয়। এই ভাবে নানা আইন ও পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে নির্বাচন কমিশন নির্বাচন প্রক্রিয়াকে ত্রুটিমুক্ত করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

নির্বাচনী অপরাধ :

নির্বাচনী অপরাধ বলতে সাধারণত আমরা বুঝি নির্বাচনে টাকার খেলা, পেশি শক্তি প্রদর্শন, রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার ইত্যাদি। প্রার্থী হওয়া বা না হওয়ার জন্য ঘুষ, প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার জন্য ভোটারকে ঘুষ, নির্দিষ্ট সীমার অতিরিক্ত নির্বাচনী ব্যয়, কোন প্রার্থীর চরিত্র ও আচরণ নিয়ে মিথ্যা প্রচার, গায়ের জোরে বুথ দখল প্রভৃতি নির্বাচনী অপরাধের দৃষ্টান্ত। রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়নের রাজনীতি ভারতীয় সমাজ ও রাজনৈতিক জীবনে এক মারণ ব্যাধি হিসাবে দেখা দিয়েছে। তৎকালীন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জি.ভি.জি. কৃষ্ণমূর্তি একটি কঠোর আইন করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন যার মাধ্যমে রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়ন ও দুর্নীতির মত ক্যানসার সম ব্যাধিকে কিছুটা হলেও কমানো যায়। ADR (Association for Democratic Reform) এর দেওয়া পরিসংখ্যান অনুসারে ২০০৪ থেকে ২০১৪- এই দশ বছরে জাতীয় বা রাজ্যস্তরের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের ১৮% (৬২৮৪৭ জনের মধ্যে ১১০৬৩ জন) এর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা রয়েছে। মোট প্রার্থীদের ৮.৪% (৫২৫৩ জন) এর বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টা, ধর্ষণ, মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ, দস্যুবৃত্তি ও ডাকাতি, অপহরণের মত গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। নব নির্বাচিত লোকসভায় (২০১৪ সাল) ১৮৬ জন (মোট সদস্যের ৩৪%) সদস্য তাদের পেশ করা হলফনামায় ফৌজদারি মামলা থাকার কথা জানিয়েছেন।

রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন নিয়ে উদ্বিগ্ন কমিশন ১৯৮৯ সালে সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়ে ছিল যে প্রস্তাবে সুপারিশ করা হয়েছিল যেসব ব্যক্তির বিরুদ্ধে গুরুতর ফৌজদারি অপরাধের অভিযোগে মামলা চলছে তাদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেওয়া না হোক। কিন্তু বহু রাজনৈতিক দল এতে আপত্তি জানায়। তাদের বক্তব্য ছিল যে অনেক সময় রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়। এই বক্তব্য অবশ্যই যথাযথ। কমিশন অবশ্য এরপর কয়েকটি রক্ষাকবচের প্রস্তাব দেয়। এগুলি হল - (ক) কেবলমাত্র খুন, ডাকাতি, ধর্ষণ, অপহরণের মত মারাত্মক অভিযোগ কারুর বিরুদ্ধে থাকলে তার ভোটে দাঁড়ানোর উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হবে, (খ) নির্বাচনের অন্তত ৬ মাস আগে দায়ের হওয়া মামলাগুলি বিবেচনার মধ্যে আনা হবে, এবং (গ) আদালতে চার্জ গঠন হতে হবে। যদিও সরকার ও সংসদ বিষয়টি নিয়ে দিনের পর দিন টালবাহানা

করে আসছে।

নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার সাধনে সুপ্রিম কোর্ট ২০০৩ সালে ভারত সরকার বনাম অ্যাসোশিয়েশন ফর ডেমোক্রাটিক রিফর্ম ও অন্যান্য মামলায় জানিয়েছে যে, গণতন্ত্রে চিরকাল তথ্য পাবার অধিকার স্বাভাবিক অধিকার হিসাবে গণ্য করা হয়েছে, এটি গণতান্ত্রিক ধারণার অবিচ্ছেদ্য অংশ। ..... সাংসদ বা বিধায়ক পদপ্রার্থীদের অপরাধ সংক্রান্ত খুঁটিনাটি তথ্যাদি জানা নির্বাচকদের মৌলিক অধিকার। আইন ভঙ্গকারীকে আইন প্রণয়নকারী হিসাবে নির্বাচিত করা ঠিক হবে কিনা নির্বাচকরা এই বিষয়ে আগে থেকেই চিন্তাভাবনা করার সুযোগ পাবে। নির্বাচন কমিশনকে সেইমত বিধান দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এই সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতেই কমিশন সমস্ত নির্বাচনে প্রার্থীদের সম্পত্তি, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং তার সঙ্গে তাঁদের অপরাধ বিষয়ক সমস্ত তথ্যাদি প্রদান করার নির্দেশ দিয়েছে। প্রার্থীরা কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন কিনা বা কোনও অপরাধমূলক কাজকর্মে আদালতে তার বিচার চলছে কিনা সে বিষয়েও জানাতে হবে।[২৩]

প্রচলিত আইন কাঠামোর মধ্যে থেকেই পরোক্ষ উপায়ে অপরাধীদের নির্বাচন প্রক্রিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য ২০০৫ সালে কমিশন একটি নির্দেশিকা জারী করে, যেখানে বলা হয় কোনও আদালত যদি কারুর বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য পরোয়ানা জারী করে এবং সংশ্লিষ্ট অভিযুক্তকে যদি ৬ মাসের বেশি সময় ধরে ধরা না যায়, তাহলে অভিযুক্তের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হবে। ধরে নেওয়া হবে অভিযুক্ত আর সংশ্লিষ্ট এলাকায় বসবাস করেন না। যার ফল এই দাঁড়ায় যে, ঐ অভিযুক্তের ভোট দেওয়া বা ভোটে দাঁড়ানো এই দুটোর কোনোটিই করার অধিকার থাকে না। এর ফলে বহু আত্মগোপনকারী অভিযুক্ত আদালতে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

তবে রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়ন রোধে ২০১৩ সালে সুপ্রিম কোর্টের একটি রায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ৮(৩) ধারা অনুসারে কোনও ব্যক্তি ফৌজদারী অপরাধের জন্য ন্যূনতম ২ বছর সাজা পেলে শাস্তি ঘোষণার দিন থেকেই জনপ্রতিনিধি হওয়ার অধিকার হারাবেন এবং মুক্তি পাওয়ার পর ৬ বছর জনপ্রতিনিধি হতে পারবেন না এবং ৮(৪) ধারা অনুসারে সাজা ঘোষণার দিন যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সংসদ বা বিধানসভার সদস্য থাকেন, তাহলে পরবর্তী ৩ মাস অথবা উচ্চ আদালতে পুনর্বিবেচনার আবেদনের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তাঁর সদস্য পদ খারিজ হবে না। জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের এই ৮(৪) ধারার বিরুদ্ধে লিলি টমাস এবং একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'লোক প্রহরীর' পক্ষে সম্পাদক এস. এন. শুক্ল ২০১৩ সালে সুপ্রিম কোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা করেন। বিচারপতি এ. কে. পট্টনায়ক ও বিচারপতি এস. জে. মুখোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ ১০ই জুলাই তার রায়ে জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ৮(৪) ধারার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে

Scanned with CamScanner

এবং এই ধারার বাতিলের পক্ষে সুপারিশ করে। শুধু তাই নয় অভিযুক্ত হওয়ার পর পরবর্তী ১০ বছরের জন্য তাঁরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষেত্রে অযোগ্য পরিগণিত হবেন। রাজনীতিকে অপরাধ মুক্ত করার দাবী নিয়ে যাঁরা আন্দোলন করছেন তাঁদের কাছে এই রায় অবশ্যই আনন্দের। তবে এই রায়ের অপব্যবহারের সম্ভাবনা নিয়েও বিতর্কের ঝড় ওঠে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আশঙ্কা প্রকাশ করে যে, এর ফলে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে বিরোধী পক্ষকে বিপদে ফেলার প্রয়াস বাড়তে পারে। তবে বিতর্ক সত্ত্বেও এই রায় কার্যকর হয়।[২৪]

কিন্তু বাস্তবে এতসব আইনকানুন আদালতের রয় সত্ত্বেও নির্বাচনে অপরাধ কিন্তু সংঘটিত হয়েই চলেছে। কমিশন এটা উপলব্ধি করেছে যে শুধুমাত্র আইন প্রণয়ন করে এই সমস্যাকে পুরোপুরি নির্মূল করা সম্ভব নয়। জনগণকেই সচেতন হতে হবে। কমিশন বারবার সৎ ও নিষ্কলঙ্ক প্রার্থীদের মনোনয়ন দেবার জন্য রাজনৈতিক দলগুলির বিবেকের কাছে আহ্বান জানিয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ রাজনৈতিক দলগুলি সেগুলি শুনেও শোনেনি। ভারতের নির্বাচন ব্যবস্থা সম্পর্কে রাজেন্দ্রপ্রসাদের একটি উক্তি উল্লেখ করতেই হয় যে, যে সমস্ত ব্যক্তি নির্বাচিত হচ্ছেন তাঁরা যদি সমর্থ, চরিত্রবান এবং ন্যায়পরায়ণ হন তাহলে তাঁরা ত্রুটিপূর্ণ সংবিধানকেও পরিপূর্ণতা দান করতে পারেন। কিন্তু তাঁরা যদি উপরোক্ত গুণের অধিকারী না হন তাহলেই যতই ত্রুটিহীন সংবিধান আমাদের থাকুক না কেন সেই সংবিধান আমাদের দেশকে রক্ষা করতে পারবে না। সংবিধান কেবল একটা নিষ্প্রাণ যন্ত্র মাত্র। মানুষই তাকে প্রাণ দান করে, মানুষের কল্যাণার্থে তাকে পরিচালনা করে এবং তাকে নিয়ন্ত্রণ করে।[২৫]

নির্বাচন সংক্রান্ত বিরোধের নিষ্পত্তি :

পূর্বে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যদি কোন বিরোধ দেখা দিত তাহলে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল গঠন করে তার নিষ্পত্তি করতে পারত। কিন্তু ১৯৬৬ সালের ১৯তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে নির্বাচন সংক্রান্ত বিরোধ মীমাংসার ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল গঠন করার ব্যবস্থা বাতিল করা হয়। এই সংশোধনী আইনে বলা হয় যে, সংসদ ও রাজ্য আইনসভায় নির্বাচন সংক্রান্ত বিরোধ-বিতর্কের ক্ষেত্রে বিচারকার্য সম্পাদন করবে হাইকোর্ট। তবে ১৯৭৫ সালে এই সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। উত্তরপ্রদেশে যে নির্বাচনী ক্ষেত্র থেকে ইন্দিরা গান্ধী সাধারণ নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন সেই নির্বাচনী ক্ষেত্রে পরাজিত প্রার্থী রাজনারায়ণ এলাহাবাদ হাইকোর্টে নির্বাচনের বৈধতা নিয়ে ইন্দিরা গন্ধীর বিরুদ্ধে মামলা করেন। ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলি ছিল তাহল, তিনি নির্বাচনী প্রচারের সময় সম্পূর্ণ বেআইনী ভাবে সরকারী সুবিধা নিয়েছেন; যেমন, রাজ্যের পুলিশকে দিয়ে নির্বাচনী জনসভার মঞ্চ বানানো, নির্বাচনে এক সরকারী অফিসারের পদের সুযোগ নেওয়া, বিদ্যুৎ দপ্তর থেকে

সরকারী অর্থে বিদ্যুৎ নেওয়া, প্রভৃতি। ১৯৭৫ সালের ১২ই জুন বিচারক জগমোহনলাল সিনহা ইন্দিরা গান্ধীর নির্বাচনকে অবৈধ ঘোষণা করেন ও তাঁর লোকসভার পদ খারিজের নির্দেশ দেন। এই রায়ের বিরুদ্ধে ইন্দিরা গান্ধী সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করেন। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ভি. আর. কৃষ্ণ লিয়ার ২৪ জুন এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়কে বহাল রাখেন এবং অবিলম্বে তিনি (ইন্দিরা গান্ধী) সাংসদ হিসাবে যে সুযোগ সুবিধা পাচ্ছিলেন তা বন্ধের নির্দেশ দেন। এই রায় প্রকাশ্যে আসার পর জয়প্রকাশ নারায়ণ জনসভা করেন যে, জনসভায় তিনি পুলিশ প্রশাসনকে সরকারের সমস্ত রকম অসাধু ও অনৈতিক নির্দেশকে অমান্য করার ডাক দেন। এই বক্তব্যকে দেশের মধ্যে এক সামরিক অভ্যুত্থানকে ইঙ্গিত করছে এই অজুহাতে ইন্দিরা গান্ধী রাষ্ট্রপতি ফকুরুদ্দিন আলি আহমেদকে দেশে জরুরী অবস্থা জারী করার জন্য অনুরোধ করেন। সেই মত রাষ্ট্রপতি ২৫ জুন রাত্রিবেলা জরুরী অবস্থা জারী করেন।

এই জরুরী অবস্থা চলাকালীন ১৯৭৫ সালের আগষ্ট মাসে ইন্দিরা সরকার সংসদে ৩৯ তম সংবিধান সংশোধনী আইন পাশ করিয়ে নেয়। এই সংশোধনীর মাধ্যমে ৭১ ও ৩২৯ ধারা এবং নবম তফসিলের পরিবর্তন করা হয়। তাছাড়া ৩২৯ (ক) এই নতুন ধারাটি সংযুক্ত করা হয়।[২৬] এই সংশোধনী আইন অনুসারে রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং লোকসভার স্পিকার নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কোন বিরোধ দেখা দিলে তার বিচার করার ক্ষমতা আদালতের পরিবর্তে সংসদের আইন কর্তৃক নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার হাতে অর্পণ করা হয়। তাছাড়া উক্ত আইন অনুসারে এক্ষেত্রে সংসদ প্রণীত আইন এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার সিদ্ধান্তের বৈধতা বিচারের ক্ষমতা আদালতের থাকবে না। আর যেদিন থেকে এই আইন কার্যকর হল সেদিন থেকে পূর্বে এই ধরনের নির্বাচন সম্পর্কিত কোর্টে যাবতীয় রায় বাতিল বলে গণ্য হবে। কিন্তু ১৯৭৭ সালে জনতা সরকার ক্ষমতায় আসার পর ১৯৭৮ সালে ৪৪ তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে উক্ত ব্যবস্থা বাতিল করে পুনরায় পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা হয়। ফলে বর্তমানে নির্বাচন সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির ভার আদালতের হস্তে ন্যস্ত।

মূল্যায়ণ :

বিশ্বের বৃহত্তম এবং সব থেকে কার্যকর গণতন্ত্র আরও একবার বিশ্বের দরবারে এক দৃষ্টান্ত হিসাবে নিজেকে তুলে ধরল। ভারতের মধ্যে এত বৈচিত্র অনেক সময়ই দেশের ঐক্যের পথে বাধা বলে মনে হয়; কিন্তু ২০১৪ সালের সাধারণ নির্বাচন আরও একবার দেখিয়ে দিল যে, শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক ভাবে এই ব্যাপক পার্থক্যকে কমিয়ে আনার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা বৈচিত্রকে এক শক্তির বিরাট আধারে পরিণত করেছে।[২৭] নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানে সময় মত জাতীয় ও আঞ্চলিক ক্ষেত্রে নির্বাচন, এক রাজনৈতিক দলের হাত থেকে আর এক রাজনৈতিক দলের হাতে শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতার প্রবাহ ভারতের

Scanned with CamScanner

গতিশীল গণতন্ত্রের সাফল্যের সূচক ধরা যেতে পারে। তৎকালীন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার টি. এন. সেশন-এর মতে জনগণের ইচ্ছাকে স্বীকৃতি প্রদানই হল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ।[১৮] আর ভারতের নির্বাচন কমিশনই হল এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর উপায়।[১৯]

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে উল্লেখযোগ্য বৈপ্লবিক ঘটনা অবশ্যই সংসদ ও বিধানসভা নির্বাচনে সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার প্রয়োগ।[২০] আর নির্বাচন যাতে অবাধ, শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্নকরা যায় তার জন্য সংবিধান রচয়িতাগণ নির্বাচন কমিশনের উপর নির্বাচন অনুষ্ঠান ও তত্ত্বাবধানের সামগ্রিক দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। পূর্বে কমিশন সম্পর্কে বলা হত নির্বাচনের লৌকিকতা সম্পাদন করতে নির্বাচন কমিশন হল প্রশাসনের একটি ডানা স্বরূপ।[২১] তবে টি. এন. সেশন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার হওয়ার পর থেকে কমিশনের পদমর্যাদার ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটে। বলা হয়ে থাকে খুব কঠোর ভাবে নির্বাচনকে পরিচালনা করার জন্য টি. এন. সেশানই নির্বাচনের নিয়মকানুন ও আচরণবিধির নখ ও দাঁত প্রাদন করেছে। নির্বাচন সুষ্ঠু ভাবে সম্পাদন করার ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তবে নির্বাচন কমিশনের মূল্যায়ণ করতে গিয়ে কমিশন সব থেকে বড় যে প্রশ্নের মুখে এসে পড়ে তা হল কমিশন তার কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ কিনা। নির্বাচন ব্যবস্থা যদি ত্রুটিপূর্ণ হয় তাহলে গণতন্ত্র বিপন্ন হতে বাধ্য। এই কথা মাথায় রেখে সংবিধান প্রণেতাগণ নির্বাচন কমিশনকে যথাসম্ভব নিরপেক্ষতার আদর্শে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এ ব্যাপারে সংবিধানের বহু ফাঁক-ফোকরের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে সমালোচকগণ দাবী করেন যে, নির্বাচন কমিশন বাস্তবে বহু ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ। তাঁরা তাঁদের এই দাবীর পিছনে কয়েকটি যুক্তি হাজির করেছেন।-

প্রথমত :- সংবিধান অনুসারে কমিশনের সদস্যগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োজিত হন। তবে কমিশনের সদস্যদের যোগ্যতা নিয়ে সংবিধান নিরব। আর রাষ্ট্রপতি নামসর্বস্ব শাসক হওয়ায় এ ব্যাপারে তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কার্য সম্পাদক করতে হয়। ফলে শাসক গোষ্ঠীর ইচ্ছা অনিচ্ছা এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। আর এর ফলে শাসক গোষ্ঠীর আস্থাভাজন ব্যক্তিরাই যে, এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন এটাই স্বাভাবিক। এছাড়া কমিশনের চাকরী থেকে অবসর নেওয়ার পর লাভজনক পদের আশায় বহু ক্ষেত্রেই কমিশনের সদস্যগণ এমন কাজ করার চেষ্টা করেন না যাতে সরকার পক্ষ বিড়ম্বনায় পড়ে।

দ্বিতীয়ত :- নির্বাচনের সময় এই বিরাট কর্মযজ্ঞের প্রধান সেনাপতি হল নির্বাচন কমিশন। কিন্তু নির্বাচন সুষ্ঠু ভাবে সম্পাদনের জন্য যে বিরাট সংখ্যক কর্মচারীর প্রয়োজন সে ব্যাপারে কমিশনকে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সহযোগিতার উপর সম্পূর্ণ রূপে নির্ভরশীল থাকতে হয়।

তৃতীয়ত :- কমিশন কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারকে যে নির্দেশ দেয় তা উভয় সরকার মানতে বাধ্য এমন নির্দেশ সংবিধানের কোথাও উল্লেখ নেই। ফলে নির্বাচন কমিশন যেন একটি হাত-পা না থাকা সংস্থাতে পরিণত হয়েছে।

চতুর্থত :- নির্বাচনের সময় ব্যাপক দুর্নীতি, কারচুপি, ভোটকেন্দ্র দখল, জাল ভোট প্রদান প্রভৃতিকে বন্ধ করতে কমিশন কার্যত ব্যর্থ বলা যায়।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার যে নির্বাচন কমিশন শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত নয়। আর এটাই নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতার সামনে সব থেকে বড় বাধা। এই সমস্ত সমস্যা সমাধানে জন্য বিভিন্ন সময় নির্বাচন সংস্কার সংক্রান্ত বিভিন্ন কমিশন বহু বার সুপারিশ করেছে, কিন্তু সেগুলির রূপায়ণ আজও সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

উপরোক্ত সমালোচনা সত্ত্বেও আমরা বলতে পারি যে, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বৈধতা রক্ষা করতে নির্বাচন কমিশনের একটা গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক ভূমিকা রয়েছে এবং এখনও পর্যন্ত কমিশন এব্যাপারে মোটামুটি সফল বলা যেতেই পারে। নির্বাচন প্রক্রিয়ার শুদ্ধতাতে বজায় রেখে গণতন্ত্রকে একটি শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করাতে কমিশনের অবদান অবশ্যই সাধুবাদ যোগ্য। তবে এক্ষেত্রে কমিশনের সাফল্য নির্ভর করবে কমিশনকে স্বাধীনতা ও কাজ করার প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রদানের উপর; তবে এক্ষেত্রে অল্পবিস্তর সীমাবদ্ধতা আরোপ করা যেতে পারে। নির্বাচন কমিশনের প্রকৃত পরীক্ষা নিহিত আছে গণতান্ত্রিক সরকারের বৈধতা এবং মুক্ত ও স্বচ্ছ নির্বাচন ব্যবস্থায় জনগণের আস্থার উপর।

তথ্যসূত্র ঃ নির্দেশিকা

1. Pylee, M.V.,(1960) "Constitutional Government in India", Delhi, S.Chand &Company Ltd, p.708.
2. Government of India, "Election Commission, Report on the first General Election in India 1951. 52" (New Delhi, 1955), p. 10.
3. Mill, J.S.,(1962) "Representative Government", London, J.M. Den & Sons, p. 291.
4. McMillan Alistair "The Election Commission", Jayal Niraj Gopal and Mehta Pratap Bhanu (ed) (2014) "Politics in India", New Delhi, Oxford University Press, 7th Edition. P.98
5. Chatterjii Rakhahari,(ed) (2014) "Politics in India: The State-Society Interface", Kolkata, Levant Publication, Third Edition, p. 120.
6. McMillan Alistair, op. cit, p.102
7. The Constitution of India, Bare Act With Short Notes (2014), Universal's, New Delhi, p.p. 143-144.

Scanned with CamScanner

ভারতীয় সংবিধানের অভিমুখে

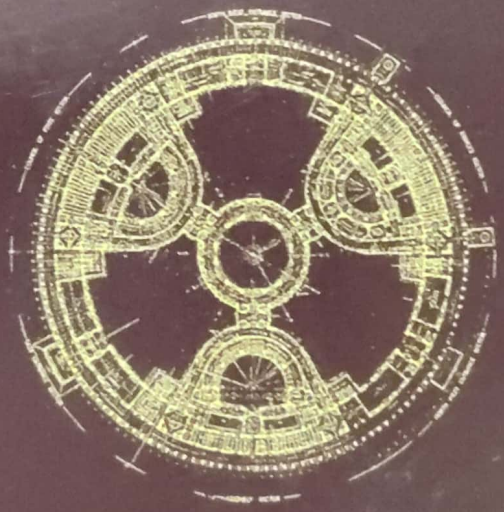

সম্পাদনা
তুহিন কুমার দাস

Scanned with CamScanner